



ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal

ISSN: 2454-1508

Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)

Volume- III, Issue-I, September, 2026, Page No. 17-23

Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711

Website: <https://www.atmadeep.in/>

DOI: 10.69655/atmadeep.vol.3.issue.01W.500



স্বামী বিবেকানন্দের ব্যবহারিক বেদান্ত ও নৈতিক মানবতাবাদ

ড. বুদ্ধদেব চট্টোপাধ্যায়, সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, বাঁকুড়া জেলা সারদামণি মহিলা মহাবিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 10.08.2026; Accepted: 14.09.2026; Available online: 30.09.2026

©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

Abstract

Swami Vivekananda's Practical Vedanta is an important reinterpretation of Vedānta in modern Indian philosophy, one that is focused on life, action, and ethics. For Vivekananda, Vedānta does not consist simply in a theoretical treatment of Brahman, Ātman, and the world; its real importance is seen in everyday human life, in character, in action, in service, in social responsibility, and in the promotion of universal welfare. He takes the Advaitic understanding of the unity of existence and turns it into an ethical ideal based on the inherent divinity of man, on respect for all living beings, on selfless action, on compassion, and on the spirit of service. In the view of Practical Vedanta, the universality of the Self, human dignity, the ethics of action, education, social equality, and spiritual freedom may all be regarded as interconnected aspects of one philosophical outlook. Vivekananda's ideas therefore aim at bringing together individual spiritual realization with the well-being of society. Practical Vedanta is therefore not just a collection of religious instructions; it is an ethical philosophy which seeks to awaken human potential and promote a just, compassionate, and spiritually based human society.

Keywords: Practical Vedanta, Swami Vivekananda, Advaita Vedānta, Ethics, Unity, Karma Yoga, Humanism, Human Dignity

স্বামী বিবেকানন্দের ব্যবহারিক বেদান্তের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল বেদান্তের তাত্ত্বিক সত্যকে জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা। তাঁর কাছে দর্শন তখনই অর্থবহ হয়, যখন তা মানুষের চিন্তা, চরিত্র এবং আচরণকে পরিবর্তিত করতে পারে। বেদান্ত যদি কেবল গ্রন্থের পাতায় সীমাবদ্ধ থাকে, তবে তার সামাজিক ও নৈতিক শক্তি পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয় না। সেই কারণে বিবেকানন্দ বেদান্তকে ব্যবহারিক করার উপর জোর দেন। তাঁর দৃষ্টিতে আত্মা, ব্রহ্ম এবং একত্বের যে উপলব্ধি শাস্ত্রে আলোচিত হয়েছে, তার প্রত্যক্ষ ফল হওয়া উচিত মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা, সত্যনিষ্ঠা, নিঃস্বার্থপরতা এবং সেবার প্রবণতা। নৈতিকতা তাঁর কাছে কোনো বাইরের চাপিয়ে দেওয়া বিধান নয়; বরং মানুষের প্রকৃত আত্মস্বরূপ উপলব্ধির স্বাভাবিক প্রকাশ। তিনি বলেন-

“নীতির সমগ্র ধারণাই এমন যে, তা কোনো অজ্ঞাত বা অজানা কিছু উপর নির্ভর করে না; নীতি এমন কোনো বিষয় শেখায় না যা মানুষের কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।”

বিবেকানন্দের ব্যবহারিক বেদান্তের কেন্দ্রবিন্দু হল মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্ব। অদ্বৈত বেদান্ত অনুসারে আত্মা মূলত এক এবং অবিভাজ্য; ব্যক্তিগত পার্থক্যগুলি বাহ্যিক স্তরে থাকলেও মানুষের গভীরতম সত্তার মধ্যে মৌলিক ঐক্য রয়েছে। এই তত্ত্বকে তিনি কেবল অধিবিদ্যাগত সিদ্ধান্ত হিসেবে গ্রহণ করেননি, বরং সামাজিক নৈতিকতার ভিত্তিতে স্থাপন করেছেন। তাঁর বক্তব্য- “তুমিই সেই সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর; তুমিই সেই আত্মা।”^২ এই ঘোষণা মানুষের আত্মসম্মান ও আত্মবিশ্বাসকে শক্তিশালী করে তুলে। ব্যক্তি নিজেকে দুর্বল, পাপী বা অক্ষম সত্তা হিসেবে দেখলে তার নৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতা সংকুচিত হয়; কিন্তু নিজের মধ্যে অসীম সম্ভাবনা অনুভব করলে সে আত্মনির্ভরতা ও দায়িত্ববোধ অর্জন করতে পারে। ফলে বেদান্তীয় আত্মদর্শন তাঁর কাছে আত্মগৌরবের অহংকার নয়, বরং আত্মশক্তির জাগরণ।

মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বের তত্ত্ব থেকেই মানবসমতার নৈতিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতি, লিঙ্গ, অর্থনৈতিক অবস্থান, সামাজিক মর্যাদা কিংবা শিক্ষাগত পার্থক্য মানুষের বাহ্যিক পরিচয়ের অংশ; কিন্তু এগুলির কোনোটি মানুষের অন্তর্নিহিত আত্মমূল্য নির্ধারণ করতে পারে না। বিবেকানন্দের মানবতাবাদ এই কারণে গভীরভাবে আধ্যাত্মিক। সকল মানুষের মধ্যে একই আত্মার উপস্থিতি স্বীকার করলে অন্যকে হেয় করা, শোষণ করা বা অবজ্ঞা করা দার্শনিকভাবেই অসঙ্গত হয়ে ওঠে। তিনি বলেন- “সকল মানুষই দেবতাস্বরূপ।”^৩ এই ধারণা আধুনিক মানবাধিকারের ভাষায় ব্যক্তিমানবের মর্যাদার সঙ্গে তুলনীয় হলেও এর ভিত্তি সম্পূর্ণভাবে বেদান্তীয়। মানুষকে সম্মান করতে হবে শুধু সে যে সমাজের সদস্য সেই বলে নয়, বরং তার অন্তরে একই আত্মা বিরাজমান রয়েছে এটা স্বীকার করে।

মানবসেবার ক্ষেত্রে বিবেকানন্দের ব্যবহারিক বেদান্ত বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি ধর্মকে মানুষের বাস্তব দুঃখ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চাননি। ক্ষুধা, অশিক্ষা, দারিদ্র্য, অসুস্থতা এবং সামাজিক অবহেলার মধ্যে থাকা মানুষের প্রতি উদাসীন থেকে কেবল ঈশ্বরের উপাসনা করা তাঁর কাছে অসম্পূর্ণ ধর্মজীবন। তিনি প্রশ্ন করেন- “তুমি যদি তোমার ভ্রাতা-মানুষকে, যিনি প্রকাশিত ঈশ্বর, তাকে উপাসনা করতে না পারো, তবে যে ঈশ্বর অপ্রকাশিত তাঁর উপাসনা কীভাবে করবে?”^৪ এই বক্তব্যে মানবসেবার ধর্মতাত্ত্বিক ভিত্তি স্পষ্ট হয়। মানুষকে সাহায্য করা এখানে দয়া দেখানো নয়; বরং মানুষের মধ্যে ঈশ্বরত্ব উপলব্ধি করে তাঁকেই সেবা করা। ফলে সেবা ও উপাসনা পরস্পর বিচ্ছিন্ন থাকে না। এই ধারণা বিবেকানন্দের কর্মমুখী ধর্মচিন্তার অন্যতম মৌলিক বৈশিষ্ট্য।

নারীর মর্যাদা এবং নারী-পুরুষের সমতার প্রশ্নও ব্যবহারিক বেদান্তের প্রভাব গভীর। যদি প্রত্যেক মানুষের মধ্যে একই আত্মা বিরাজমান হয়, তবে নারীকে নৈতিক, বৌদ্ধিক বা আধ্যাত্মিকভাবে নিম্নতর মনে করার কোনো দার্শনিক ভিত্তি থাকে না। বিবেকানন্দ ধর্মীয়তার মাপকাঠি হিসেবে মানুষের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিকে সামনে আনেন। তিনি বলেন, “যেদিন থেকে তুমি নারী ও পুরুষের মধ্যে ঈশ্বরকে দেখতে শুরু করবে, সেদিন থেকেই আমি তোমাকে ধর্মীয় মানুষ বলব।”^৫ এখানে ধর্মীয়তার প্রকৃত মানদণ্ড বাহ্যিক আচার নয়; নারী ও পুরুষ উভয়ের মধ্যে সমান দেবত্বের উপলব্ধি। তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গি সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা, মর্যাদা এবং পারস্পরিক সম্মানের নৈতিক ভিত্তিকে শক্তিশালী করে।

বিবেকানন্দের ব্যবহারিক বেদান্তে কর্মের নৈতিক মূল্যায়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কর্ম মানুষের জীবনকে গঠন করে এবং কর্মের মাধ্যমে ব্যক্তির চরিত্র প্রকাশিত হয়। কিন্তু কর্মের মূল্য শুধু ব্যক্তিগত সাফল্য বা বাহ্যিক ফলের দ্বারা নির্ধারিত হয় না। কোনো কর্ম মানুষকে বিভক্ত করছে, না একত্বের দিকে নিয়ে যাচ্ছে— এই প্রশ্নও গুরুত্বপূর্ণ। বিবেকানন্দ বলেন- “আমাদের প্রত্যেকটি কর্মের ক্ষেত্রে বিচার করতে

হবে— সেটি কি বৈচিত্র্যের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, না একত্বের দিকে?”^৬ অর্থাৎ নৈতিকতার একটি প্রধান মানদণ্ড হল ঐক্য ও কল্যাণ। তিনি আরও বলেন—

“যদি কোনো কাজ বৈচিত্র্য বাড়ায়, তবে তা আমাদের পরিত্যাগ করতে হবে; কিন্তু যদি তা একত্বের দিকে নিয়ে যায়, তবে আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে কাজটি ভালো।”^৭

এই কর্মনৈতিকতা ব্যক্তি-স্বার্থের পরিবর্তে বৃহত্তর মানবকল্যাণকে গুরুত্ব দেয়।

এই কর্মনৈতিকতার সঙ্গে নিঃস্বার্থতার সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। ব্যক্তি যখন নিজের কর্মকে কেবল ব্যক্তিগত লাভের উপায় হিসেবে দেখে, তখন কর্ম আত্মকেন্দ্রিকতা বৃদ্ধি করতে পারে। কিন্তু কর্ম যদি বৃহত্তর কল্যাণের উদ্দেশ্যে সম্পাদিত হয়, তবে তা আত্মশুদ্ধি ও চরিত্রগঠনের মাধ্যম হয়ে ওঠে। তাঁর ফলিত বেদান্তে কর্ম শুধু তাই সামাজিক কর্তব্য নয়; এটি আধ্যাত্মিক সাধনাও। বিবেকানন্দ বলেন— “বেদান্ত বলে—কর্ম করো, সর্বত্র ঈশ্বরকে স্থাপন করে এবং সর্বত্র তাঁর উপস্থিতি জেনে।”^৮ এই বক্তব্যে কর্মের মধ্যে ঈশ্বরদর্শনের ধারণা প্রকাশ পেয়েছে। মানুষ যদি প্রতিটি কর্মে অন্যের মধ্যে একই আত্মাকে অনুভব করে, তবে তার কর্মে শোষণ, প্রতারণা ও স্বার্থপরতার স্থান কমে আসে।

সহমর্মিতা ও পরার্থপরতা বিবেকানন্দের নৈতিক মানবতাবাদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। অন্যের দুঃখকে কেবল বাহ্যিক ঘটনা হিসেবে দেখা এবং তার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন থাকা একত্ববোধের বিরোধী। তিনি প্রশ্ন করেন - “তুমি কি অন্যের জন্য অনুভব কর? যদি করো, তবে তুমি একত্বের দিকে অগ্রসর হচ্ছ।”^৯ এখানে ‘অন্যের জন্য অনুভব করা’ কেবল আবেগের বিষয় নয়; এটি নৈতিক কর্মের সূচনা। অন্যের কষ্ট অনুভব করলে তার সাহায্যে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা সৃষ্টি হয়। এইভাবে সহমর্মিতা ব্যক্তিগত অনুভূতি থেকে সামাজিক দায়িত্বে পরিণত হয়। বিবেকানন্দের মানবতাবাদ তাই নিষ্ক্রিয় সহানুভূতি নয়; তা সক্রিয় সেবার আহ্বান।

নৈতিকতা ও অধিবিদ্যার সম্পর্ক বিবেকানন্দের দর্শনে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। পাশ্চাত্য নৈতিক দর্শনের কিছু ধারায় নৈতিকতার ভিত্তি কর্তব্য, সুখ, উপযোগিতা বা সামাজিক চুক্তিতে অনুসন্ধান করা হয়; বিবেকানন্দের ক্ষেত্রে এর গভীর ভিত্তি আত্মার একত্ব। তিনি বলেন, “নৈতিকতা ও নিঃস্বার্থতার সর্বোচ্চ আদর্শ সর্বোচ্চ অধিবিদ্যক ধারণার সঙ্গে হাত ধরাধরি করে চলে।”^{১০} অর্থাৎ নৈতিকতা কোনো বিচ্ছিন্ন সামাজিক নিয়ম নয়; মানুষের প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে জ্ঞান যত গভীর হয়, ততই নিঃস্বার্থতা ও নৈতিকতার প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট হয়। অদ্বৈত উপলব্ধি যদি সত্য হয়, তবে অন্যকে ক্ষতি করা শেষ পর্যন্ত নিজেরই গভীরতর সত্তাকে আঘাত করা।

বিবেকানন্দের শিক্ষা-ভাবনাও ফলিত বেদান্তের মানবদর্শনের সঙ্গে সম্পর্কিত। তাঁর কাছে শিক্ষা কেবল তথ্য, পরীক্ষা বা পেশাগত দক্ষতা অর্জনের ব্যবস্থা নয়; শিক্ষা মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তির প্রকাশ ঘটানোর প্রক্রিয়া। মানুষের মধ্যে আত্মবিশ্বাস, চরিত্র, সাহস, বিচারবোধ এবং নৈতিক দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তোলাই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য। এই শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের উন্নয়নের ভিত্তি তৈরি করে। বেদান্তীয় মানবদর্শনে মানুষকে দুর্বল ও নির্ভরশীল করে রাখা নয়, বরং তার অন্তর্নিহিত শক্তিকে জাগিয়ে তোলা গুরুত্বপূর্ণ। ফলে শিক্ষা সামাজিক মুক্তির একটি মাধ্যমও হয়ে ওঠে।

মানুষের প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে বিবেকানন্দের বক্তব্য তাঁর শিক্ষাদর্শন ও নৈতিক দর্শন উভয়কেই ব্যাখ্যা করে। তিনি বলেন, “বেদান্তের আদর্শ হল মানুষকে সে প্রকৃতপক্ষে যেমন, তাকে তেমনভাবে জানা।”^{১১} তাঁর এই বক্তব্যের মধ্যে মানুষের সম্ভাবনার প্রতি গভীর আস্থা নিহিত রয়েছে। মানুষকে কেবল তার বর্তমান

দুর্বলতা দিয়ে বিচার না করে তার অন্তর্নিহিত পূর্ণতার সম্ভাবনাকে স্বীকার করতে হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গি আত্মবিশ্বাস, স্বাধীনতা ও চরিত্রগঠনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তি যদি নিজের মধ্যে শক্তি অনুভব করে, তবে সে অন্যের ওপর নির্ভরশীলতা থেকে বেরিয়ে এসে নিজের জীবন ও সমাজের প্রতি দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে।

স্বাধীনতার ধারণাও ব্যবহারিক বেদান্তে গুরুত্বপূর্ণ। আত্মার প্রকৃতি স্বাধীন; বাহ্যিক বাধা, ভয় ও অজ্ঞতা মানুষের প্রকৃত শক্তিকে আচ্ছন্ন করে। তাই মুক্তি শুধু মৃত্যুর পরে কোনো আধ্যাত্মিক অবস্থায় পৌঁছানো নয়; জীবনের মধ্যেই ভয়, দুর্বলতা, সংকীর্ণতা ও আত্মকেন্দ্রিকতা অতিক্রম করা। এই স্বাধীনতা ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার করলেও তা অন্যের স্বাধীনতার বিরোধী নয়। কারণ একত্ববোধ ব্যক্তি ও অপরের সম্পর্ককে সহযোগিতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার ভিত্তিতে স্থাপন করে। ফলে ব্যবহারিক বেদান্তের স্বাধীনতা নৈতিক স্বাধীনতা— যেখানে ব্যক্তি নিজের শক্তিকে বৃহত্তর কল্যাণে ব্যবহার করতে শেখে।

সমাজজীবনের ক্ষেত্রে ব্যবহারিক বেদান্তের একটি বিশেষ তাৎপর্য হল বিভাজনের বিরুদ্ধে এর অবস্থান। ধর্ম, জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ, অর্থনৈতিক অবস্থান কিংবা সামাজিক পরিচয়ের ভিত্তিতে মানুষকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করার প্রবণতা একত্ববোধের বিরোধী। বিবেকানন্দের দর্শনে বৈচিত্র্য অস্বীকার করা হয় না; বরং বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য আবিষ্কার করা হয়। প্রত্যেক ব্যক্তি স্বতন্ত্র হলেও তার গভীরতম সত্তা একই। এই উপলব্ধি সামাজিক সহিষ্ণুতা এবং পারস্পরিক সম্মানের ভিত্তি গড়ে তুলতে পারে।

দারিদ্র্য ও সামাজিক বঞ্চনার প্রশ্নে বিবেকানন্দের ব্যবহারিক বেদান্ত আরও প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। তিনি আধ্যাত্মিক উন্নতিকে মানুষের বাস্তব জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চাননি। ক্ষুধার্ত মানুষের কাছে কেবল ধর্মতত্ত্বের ভাষণ অর্থহীন হয়ে পড়তে পারে; প্রথমে তার জীবনধারণের প্রয়োজন পূরণ, শিক্ষা ও আত্মশক্তির বিকাশ ঘটতে হবে। মানবসেবা তাই সমাজসংস্কারের সঙ্গে যুক্ত। দরিদ্র মানুষকে করুণার পাত্র হিসেবে নয়, মর্যাদাসম্পন্ন মানুষ হিসেবে দেখা— এই দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর মানবতাবাদের বিশেষ শক্তি। সেবার উদ্দেশ্য কেবল সমস্যার সাময়িক সমাধান নয় বরং মানুষের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও সক্ষমতাকে জাগিয়ে তোলা।

ব্যবহারিক বেদান্তের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল ধর্মের সর্বজনীনতা। বিবেকানন্দ ধর্মকে কোনো একক সম্প্রদায়ের সম্পত্তি হিসেবে দেখেননি। বিভিন্ন ধর্মীয় পথের মধ্যে মতভেদ থাকলেও মানুষের আধ্যাত্মিক অনুসন্ধানের গভীরে একটি ঐক্য রয়েছে। ব্যবহারিক বেদান্ত তাই ধর্মীয় সহিষ্ণুতাকে কেবল সামাজিক শিষ্টাচার হিসেবে নয়, আধ্যাত্মিক সত্যের স্বাভাবিক ফল হিসেবে বিবেচনা করে। অন্যের বিশ্বাসকে সম্মান করা মানে নিজের বিশ্বাস ত্যাগ করা নয়; বরং সত্যের বহুমাত্রিক প্রকাশকে স্বীকার করা। এই দৃষ্টিভঙ্গি ধর্মীয় সংঘাতের পরিবর্তে পারস্পরিক সম্মান ও সংলাপের সম্ভাবনা সৃষ্টি করে।

আধুনিক সমাজে বিবেকানন্দের ব্যবহারিক বেদান্তের প্রাসঙ্গিকতা এই কারণে বিশেষ যে বর্তমান সভ্যতা প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত হলেও মানুষের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা, প্রতিযোগিতা, ভয়, বৈষম্য এবং স্বার্থকেন্দ্রিকতা এখনও প্রবল। এই পরিস্থিতিতে মানুষের অন্তর্নিহিত মর্যাদা এবং অন্যের প্রতি দায়িত্বের ধারণা নতুনভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। বেদান্তের একত্ববোধ ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ককে নতুনভাবে ভাবতে সাহায্য করে। মানুষের উন্নয়ন কেবল অর্থনৈতিক সূচকে নয় বরং তা চরিত্র, সহমর্মিতা, নৈতিকতা এবং সামাজিক দায়িত্বের দিক থেকেও বিচার করা দরকার।

বিবেকানন্দের ব্যবহারিক বেদান্তে বিজ্ঞান ও যুক্তির প্রতিও একটি ইতিবাচক মনোভাব লক্ষ করা যায়। তিনি অন্ধ বিশ্বাসের পরিবর্তে অভিজ্ঞতা, আত্ম-অনুসন্ধান এবং যুক্তিসঙ্গত উপলব্ধির উপর গুরুত্ব দেন। তবে তাঁর যুক্তিবাদ নিছক বস্তুবাদী নয়; মানুষের চেতনা ও আত্মিক সম্ভাবনাকেও তিনি জ্ঞানের পরিসরের অন্তর্ভুক্ত

করেন। ফলে ব্যবহারিক বেদান্ত আধুনিকতার সঙ্গে ঐতিহ্যের একটি সৃজনশীল সংলাপ গড়ে তোলে। প্রাচীন বেদান্তীয় তত্ত্বকে তিনি এমন ভাষায় প্রকাশ করেন যা আধুনিক শিক্ষিত মানুষের জীবন, নৈতিকতা এবং সামাজিক দায়িত্বের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে।

কাজেই ব্যবহারিক বেদান্তের মূল শক্তি তার সমন্বয়ী চরিত্রে। এখানে জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি, নৈতিকতা, শিক্ষা এবং মানবসেবা পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়। আত্মার একত্বের জ্ঞান মানুষের প্রতি ভালোবাসা ও সেবায় প্রকাশিত হয়; সেবা কর্মকে নিঃস্বার্থ করে; নিঃস্বার্থ কর্ম চরিত্র গঠন করে; চরিত্রের উন্নতি ব্যক্তি ও সমাজের কল্যাণে সহায়তা করে। এই ধারায় আধ্যাত্মিকতা কোনো জগত-বিমুখ অবস্থান নয়, বরং জগতের মধ্যেই আত্মিক সত্যকে উপলব্ধি করার পথ। বিবেকানন্দের এই দৃষ্টিভঙ্গি ভারতীয় দর্শনের নৈতিক সম্ভাবনাকে আধুনিক সামাজিক জীবনের সঙ্গে যুক্ত করেছে।

ব্যবহারিক বেদান্তের সঙ্গে কর্মযোগের সম্পর্কও অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। কর্মযোগে কর্ম থেকে পালিয়ে যাওয়া নয়, কর্মের মধ্যেই অনাসক্তি ও নিঃস্বার্থতার চর্চা গুরুত্বপূর্ণ। মানুষ সমাজে বসবাস করে এবং নানা সম্পর্ক ও দায়িত্বের মধ্যে কাজ করে; তাই কর্মহীনতা কোনো বাস্তব সমাধান নয়। বরং কর্মের উদ্দেশ্য, মানসিকতা এবং নৈতিক চরিত্রকে পরিবর্তন করাই প্রয়োজন। নিজের কর্মকে বৃহত্তর কল্যাণের সঙ্গে যুক্ত করলে কর্ম আত্মকেন্দ্রিকতার পরিবর্তে আত্মবিকাশের মাধ্যম হয়। ব্যবহারিক বেদান্ত এই কর্মযোগী মনোভাবকে সামাজিক জীবনে প্রয়োগ করে। শিক্ষক, চিকিৎসক, শ্রমিক, প্রশাসক, সমাজকর্মী কিংবা সাধারণ নাগরিক—প্রত্যেকেই নিজের কর্তব্যকে সৎ ও নিঃস্বার্থভাবে সম্পাদন করলে কর্ম নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্য অর্জন করে।

মানুষের মর্যাদার প্রশ্নে বিবেকানন্দের অবস্থান বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ তাঁর মানবতাবাদ মানুষের বাহ্যিক সাফল্যের উপর গুরুত্ব দেয় না। বরং ধনী বা দরিদ্র, শিক্ষিত বা অশিক্ষিত, শক্তিশালী বা দুর্বল—প্রত্যেক মানুষের মধ্যে অন্তর্নিহিত মূল্য রয়েছে। এই ধারণা সামাজিক কল্যাণের একটি গভীর ভিত্তি প্রদান করে। যদি মানুষের মর্যাদা তার অর্থ বা সামাজিক অবস্থানের উপর নির্ভর না করে, তবে সমাজের দুর্বলতম মানুষের অধিকার ও কল্যাণকে অবহেলা করা যায় না। তাই ব্যবহারিক বেদান্ত মানুষের সামাজিক দায়িত্বের একটি নৈতিক যুক্তি প্রদান করে। মানুষের উন্নয়ন বলতে কেবল কয়েকজনের উন্নতি নয়; সমাজের প্রত্যেক সদস্যের আত্মশক্তি বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করাও তার অন্তর্ভুক্ত।

বিবেকানন্দের ব্যবহারিক বেদান্ত ব্যক্তিস্বাধীনতা ও সামাজিক দায়িত্বের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে। ব্যক্তি নিজের আত্মিক শক্তির বিকাশের জন্য স্বাধীন, কিন্তু সেই স্বাধীনতা অন্যের ক্ষতির কারণ হতে পারে না। কারণ অন্যের মধ্যে যে আত্মা বিরাজমান, নিজের মধ্যেও সেই আত্মাই বিরাজমান। এই উপলব্ধি স্বাধীনতাকে নৈতিক সীমা প্রদান করে। ব্যক্তি নিজের প্রতিভা ও শক্তিকে নিজের উন্নতির পাশাপাশি সমাজের কল্যাণে ব্যবহার করবে—এই প্রত্যাশাই ব্যবহারিক বেদান্তের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ফলে স্বাধীনতা এখানে স্বেচ্ছাচার নয়; বরং আত্মনিয়ন্ত্রণ, দায়িত্ব এবং নৈতিক পরিণতিবোধের সঙ্গে যুক্ত।

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষেত্রেও এই চিন্তার তাৎপর্য রয়েছে। পরীক্ষামুখী শিক্ষা যদি কেবল তথ্য ও চাকরির যোগ্যতা প্রদান করে কিন্তু চরিত্র, সহমর্মিতা ও সামাজিক দায়িত্ববোধ গড়ে না তোলে, তবে শিক্ষার উদ্দেশ্য অসম্পূর্ণ থেকে যায়। বিবেকানন্দের শিক্ষা-ভাবনা ব্যক্তির অন্তর্নিহিত শক্তি জাগিয়ে তোলার উপর গুরুত্ব দেয়। তাই শিক্ষা হওয়া উচিত এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ব্যক্তি নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন হয়, ভয় ও হীনমন্যতা অতিক্রম করে এবং অন্যের প্রতি দায়িত্বশীল নাগরিক হয়ে ওঠে।

সমকালীন বিশ্বে ধর্মীয় বহুত্ব ও সামাজিক সংঘাতের প্রেক্ষাপটে বিবেকানন্দের একত্ববোধ নতুন অর্থ লাভ করে। একত্ব মানে সব পার্থক্য মুছে দেওয়া নয়; বরং পার্থক্যের মধ্যেও একটি গভীর মানবিক সম্পর্ক স্বীকার করা। বিভিন্ন ধর্ম, সংস্কৃতি ও মতের মানুষ নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেও পরস্পরের মর্যাদা স্বীকার করতে পারা। এই দৃষ্টিভঙ্গি ধর্মীয় সহিষ্ণুতাকে কেবল সহনশীলতার স্তরে না রেখে পারস্পরিক সম্মানের স্তরে উন্নীত করে। ব্যবহারিক বেদান্ত তাই বহুত্ববাদী সমাজে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য একটি নৈতিক ভিত্তি দিতে পারে।

বিবেকানন্দের নৈতিক দর্শনে আত্মশক্তি ও পরার্থপরতা পরস্পরবিরোধী নয়। সাধারণত মনে করা হয় যে নিজের উন্নতি এবং অন্যের কল্যাণ দুটি পৃথক লক্ষ্য; কিন্তু ব্যবহারিক বেদান্ত এই বিভাজন অতিক্রম করে। ব্যক্তি যখন নিজের অন্তর্নিহিত শক্তি উপলব্ধি করে, তখন তার আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায় এবং সেই শক্তিকে বৃহত্তর কল্যাণে নিয়োজিত করার সামর্থ্যও বাড়ে। আবার অন্যের সেবায় আত্মনিয়োগ করার মধ্য দিয়েও ব্যক্তির অহংকার, সংকীর্ণতা ও স্বার্থপরতা কমে যায়। ফলে আত্মোন্নতি ও পরসেবার মধ্যে একটি পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এই সমন্বয়ই বিবেকানন্দের নৈতিক মানবতাবাদকে বিশেষ বৈশিষ্ট্য প্রদান করে।

এই দৃষ্টিভঙ্গির আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ফল হল দায়িত্ববোধের বিস্তার। ব্যক্তি শুধু নিজের পরিবার বা নিকটজনের প্রতি নয়, বৃহত্তর সমাজ এবং মানবসমাজের প্রতিও দায়বদ্ধ। কারণ একত্ববোধ সম্পর্কের পরিসরকে ক্রমশ বিস্তৃত করে। নিজের স্বার্থ থেকে পরিবার, পরিবার থেকে সমাজ, সমাজ থেকে দেশ এবং শেষ পর্যন্ত সমগ্র মানবতার দিকে দায়িত্বের বিস্তার ঘটে। এই বিস্তৃত দায়িত্ববোধই ব্যবহারিক বেদান্তকে একটি সার্বজনীন নৈতিক দর্শনে পরিণত করে। এখানে দেশপ্রেমও মানবপ্রেমের বিরোধী নয়; বরং নিজের সমাজের উন্নতির মাধ্যমে বৃহত্তর মানবকল্যাণে অংশ নেওয়ার একটি পথ।

ব্যবহারিক বেদান্তের এই নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্তিগত চরিত্রগঠনের ক্ষেত্রেও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সত্যবাদিতা, আত্মসংযম, সাহস, সহিষ্ণুতা এবং অপরের প্রতি সম্মান— এই গুণগুলি কোনো বিচ্ছিন্ন নৈতিক বিধান নয়; এগুলি আত্মার মর্যাদা উপলব্ধির বাস্তব প্রকাশ। যে ব্যক্তি নিজের মধ্যে শক্তি ও মর্যাদা অনুভব করে, সে অন্যকেও মর্যাদা দিতে শেখে। আবার যে ব্যক্তি অন্যের মর্যাদা স্বীকার করে, তার নিজের চরিত্রও আরও পরিণত হয়। এই পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে ব্যবহারিক বেদান্ত ব্যক্তিনৈতিকতা ও সামাজিক নৈতিকতাকে একটি অভিন্ন কাঠামোর মধ্যে স্থাপন করে। এই কারণে বিবেকানন্দের নৈতিকতা একই সঙ্গে আত্মিক, ব্যক্তিগত এবং সামাজিক। এই সমন্বয়ী দৃষ্টিভঙ্গিই তাঁর দর্শনকে কেবল ব্যক্তিগত সাধনার বিষয় না রেখে সমাজ ও মানবকল্যাণের সক্রিয় নৈতিক আদর্শে পরিণত করেছে। এর ফলে বেদান্তের তত্ত্ব জীবনযাপনের নৈতিক অনুশীলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হয়।

স্বামী বিবেকানন্দের ব্যবহারিক বেদান্তের অদ্বৈত বেদান্তকে একটি সক্রিয় নৈতিক মানবতাবাদে রূপান্তরিত করে। আত্মার একত্ব, মানুষের মর্যাদা, নিঃস্বার্থ কর্ম, সহমর্মিতা, শিক্ষা, স্বাধীনতা এবং সেবার আদর্শের মাধ্যমে তিনি দেখিয়েছেন যে আধ্যাত্মিকতা ও নৈতিকতা পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়। মানুষের মধ্যে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা মানে মানুষের প্রতি দায়িত্ব গ্রহণ করা; আত্মার একত্ব উপলব্ধি করা মানে বিভাজন ও সংকীর্ণতার উর্ধ্বে ওঠা। তাই ব্যবহারিক বেদান্ত কেবল ব্যক্তিগত মুক্তির দর্শন নয়, বরং ব্যক্তি ও সমাজের নৈতিক পুনর্গঠনের একটি শক্তিশালী দর্শন। বর্তমান বিশ্বে যখন অর্থনৈতিক উন্নতির পাশাপাশি মানবিক মূল্যবোধের সংকটও প্রকট, তখন বিবেকানন্দের মানুষের সেবা, নিঃস্বার্থতা এবং একত্ববোধের শিক্ষা নতুন তাৎপর্য লাভ করে। তাঁর ব্যবহারিক বেদান্ত মানুষকে নিজের অন্তর্নিহিত শক্তি উপলব্ধি করে অন্যের কল্যাণে পর্ব-৩, সংখ্যা-১, সেপ্টেম্বর, ২০২৬

আত্মনিয়োগ করার আস্থান জানায়; এই কারণেই তাঁর ব্যবহারিক বেদান্ত আজও নৈতিক দর্শন, সামাজিক চিন্তা এবং মানবকল্যাণের আলোচনায় প্রাসঙ্গিক।

তথ্যসূত্র:

১. বিবেকানন্দ, স্বামী। প্র্যাকটিক্যাল বেদান্ত। অদ্বৈত আশ্রম, ১৯৪৬, পৃ. ৩০৫।
২. বিবেকানন্দ, স্বামী। প্র্যাকটিক্যাল বেদান্ত। অদ্বৈত আশ্রম, ১৯৪৬, পৃ. ৩০৫।
৩. বিবেকানন্দ, স্বামী। প্র্যাকটিক্যাল বেদান্ত। অদ্বৈত আশ্রম, ১৯৪৬, পৃ. ৩১৭-৩১৯।
৪. বিবেকানন্দ, স্বামী। প্র্যাকটিক্যাল বেদান্ত। অদ্বৈত আশ্রম, ১৯৪৬, পৃ. ৩১৮-৩১৯।
৫. বিবেকানন্দ, স্বামী। প্র্যাকটিক্যাল বেদান্ত। অদ্বৈত আশ্রম, ১৯৪৬, পৃ. ৩১৯।
৬. বিবেকানন্দ, স্বামী। প্র্যাকটিক্যাল বেদান্ত। অদ্বৈত আশ্রম, ১৯৪৬, পৃ. ৩৩৮।
৭. বিবেকানন্দ, স্বামী। প্র্যাকটিক্যাল বেদান্ত। অদ্বৈত আশ্রম, ১৯৪৬, পৃ. ৩৩৮।
৮. বিবেকানন্দ, স্বামী। প্র্যাকটিক্যাল বেদান্ত। অদ্বৈত আশ্রম, ১৯৪৬, পৃ. ১৪২।
৯. বিবেকানন্দ, স্বামী। প্র্যাকটিক্যাল বেদান্ত। অদ্বৈত আশ্রম, ১৯৪৬, পৃ. ৩৫৫।
১০. বিবেকানন্দ, স্বামী। প্র্যাকটিক্যাল বেদান্ত। অদ্বৈত আশ্রম, ১৯৪৬, পৃ. ৩৫৫।
১১. বিবেকানন্দ, স্বামী। প্র্যাকটিক্যাল বেদান্ত। অদ্বৈত আশ্রম, ১৯৪৬, পৃ. ৩১৮।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. বিবেকানন্দ, স্বামী। প্র্যাকটিক্যাল বেদান্ত। অদ্বৈত আশ্রম, ১৯৪৬, কলকাতা।
২. বিবেকানন্দ, স্বামী। দ্য কমপ্লিট ওয়াক্স অব স্বামী বিবেকানন্দ (খণ্ড ২)। অদ্বৈত আশ্রম, ২০১৬, কলকাতা।
৩. বিবেকানন্দ, স্বামী। কর্মযোগ। উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১৭, কলকাতা।
৪. বিবেকানন্দ, স্বামী। জ্ঞানযোগ। উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১৬, কলকাতা।
৫. রামবচন, অনন্তানন্দ। দ্য লিমিটস অব স্ক্রিপচার: বিবেকানন্দ'স রিইন্টারপ্রিটেশন অব দ্য বেদাস। ইউনিভার্সিটি অব হাওয়াই প্রেস, ১৯৯৪, হনোলুলু।
৬. নিখিলানন্দ, স্বামী। বিবেকানন্দ: এ বায়োগ্রাফি। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেন্টার, ১৯৫৩, নিউ ইয়র্ক।